Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024

ISSN 2583-6706 (Online)

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ধর্ম

বেবী সাউ

Link : https://bit.ly/3HrgZ9L

সারসংক্ষেপ : ধর্ম এবং ঈশ্বর চেতনায় মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা এক স্বতন্ত্র ভাবনা। তিনি তাঁর নিজের মতো করে সেই শাশ্বত সুন্দরের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। তিনি কখনো মানুষের মধ্যে, প্রকৃতির মাঝে কিংবা শান্ত নির্জন কোনো পোড়োবাড়িতে খুঁজেছেন আরাধ্য দেবদেবীকে। তাঁর ধর্ম তাঁরই। নিজস্ব এক আধ্যাত্মিক বিশ্বে তিনি বসবাস করতেন এবং প্রকৃতিকে সেভাবেই আবিষ্কার করতেন। প্রকৃতি, কাহিনি, লোকাচার, প্রতীক এবং ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষকে খুঁজে পাওয়ার যে অনন্ত সাধনা তিনি করেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি মণীন্দ্র গুপ্তের নিজস্ব ঘরানার এক আশ্চর্য কাব্যভুবন।

সূচক শব্দ : ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, বিচ্ছিন্ন দৃশ্য, মহাপ্রকৃতি, চিহ্ন, রূপক, প্রতীক, অনাদি, অনন্ত, সামগ্রিকতা, শংকরাচার্য, বারুচ স্পিনোজা, এথিকস, সর্বেশ্বরবাদ, লোকাচার, প্রতীক, মোক্ষ

ধর্ম কথাটির অর্থ ধারণ করা। অনুশাসন সেই ধারণ করাকে পরিণত করে নিয়মে। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত অর্থকেই যদি ধর্মের অনুসন্ধান হিসেবে জানতে চেষ্টা করা হয়, তাহলে, দেখা যাবে, তার মধ্যে অনুশাসনের নিয়মগুলিকে পেরিয়ে রয়েছে জীবনের ও প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রথম থেকেই যা ছিল তা হলো প্রকৃতির সঙ্গে একপ্রকার সংযোগ। আধুনিকতার অস্তিত্ববাদী বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সঙ্গে মহাপ্রকৃতির সামগ্রিকতার এক সংযোগ রয়েছে। এই সংযোগকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর বড়ো হওয়ার মাধ্যমেই। অক্ষয় মালবেরি[১] শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ের ছত্রে ছত্রে রয়েছে মণীন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে প্রকৃতির সহবাসের চিহ্ন। যে প্রকৃতি তাঁকে বড়ো করে তুলছে, সেই প্রকৃতিই তাঁর মধ্যে জন্ম দিয়েছে একধরনের ঈশ্বরবোধ। কেমন সেই ঈশ্বরবোধ, যে কারণে তথাকথিত ধার্মিক না হয়েও মণীন্দ্র গুপ্তের মধ্যে ছিল একধরনের আস্তিকতা এবং তারও চেয়ে বেশি একপ্রকার আধ্যাত্মিকতা? তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যায় ঈশ্বরের বৃহত্তর অর্থের জন্যই তিনি ব্যাকুল ছিলেন। একটি কবিতার মধ্য দিয়ে হয়তো তাঁর ঈশ্বর সংক্রান্ত ভাবনা স্পষ্ট হবে —

'মনে করো :
প্রলয়ের পরে নতুন পৃথিবী জাগছে — অন্ধ শূন্যে মেঘের মতো সাদা মাটি।
এইবার কি কি চাই বলো।'
'সূর্য, হাওয়া, জলাশয়,
গাছ অবশ্যই...'
'আর তুমি?'
'হ্যাঁ হ্যাঁ — স্বতঃসিদ্ধ আমিতো আছিই।'
'আর কিছু — ? মেঘেরং, জলেমাছ, শূন্যেপাখি, ঋতু, স্বপ্ন,
স্মৃতি, ভবিষ্যৎ — এসব চাও না?'
'চাই কিনা ভাবতে চাই — ফের কোন প্যাঁচে পড়ে যাব...'
'ভাবো দৃশ্য সকাল সন্ধ্যার দুপুরের, জলের রহস্য আর পাহাড়ের মায়া,
শস্য নারী সন্তানের টান, পার্বণ গোষ্ঠীর সুখ যুদ্ধ ঘৃণা জয়।
ভাবো হোটেল হরিণ অশ্ব জাগুয়ার গাড়ি। ভাবো মদ মধু অসংখ্য মৈথুন।
ভাবো ল্যাসো ফাঁদ কার্তুজ আগুন
পরাজয়।'

‘এ জটিল জাল, আমি ডোমকানা বাঁশবনে—
অবিরল বৃষ্টি পড়ছে — কথা ছিল মরা পোড়াবার—
এই বাঁশবনের সন্ধ্যাবেলা লাবণ্যও ভূতের খপ্পরে পড়ে গেছি। বাঁচাও!
শ্মশানে যাব।’
‘যাবে অবশ্যই। ভাবো
ঈশ্বর তোমার চেয়ে কতগুণ দুঃসাহসী কবি।’[২] (ঈশ্বর, লাল স্কুল বাড়ি, মণীন্দ্র গুপ্ত)

এই কবিতাটি থেকেই আমরা বুঝতে পারি তিনি মহাপ্রকৃতিকেই স্বয়ং এক চালিকাশক্তি হিসেবে দেখছেন শুধু তাই নয়, এই সৃষ্টিকর্মের মধ্যে যে কবিত্ব লুকিয়ে আছে, তাকেও লক্ষ করছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সহবাসের এক সাক্ষ্য পেয়ে যাই যখন তিনি এক অত্যাশ্চর্য ভাবনার কথা লেখেন তাঁর উপন্যাসে — নুড়িপাথর কী করে বাঁদর হয়ে যায়? এও কি সম্ভব? কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব কালে সবই হতো। মহাভারতের শুরুতেই আছে, রাজা উপরিচর বসুর রাজধানীর কাছে শুক্তিমতী নদী ছিল। কোলাহল নামে পর্বত এই নদীর গর্ভে এক ছেলে আর এক মেয়ে উৎপন্ন করে। রাজা উপরিচর এই মেয়েটিকে তাঁর রানি করেন। সেকালের প্রথাগত বংশধারা অনুযায়ী এই নারীই হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের দিদিমা। মহাভারতের সময়ে যদি এসব ঘটতে পারে তবে এখনই বা ঘটবে না কেন? দু’বার উপ উপ করে ডাকল নুড়ি বাঁদর, যেন দেখল গলার আওয়াজ ঠিক আছে কিনা। হিমানীরেখার দু’হাজার ফুট ওপরে বড়ো গাছ প্রায় নেই, বেঁটে গুল্ম আর পাথরের খাঁজে ফাটলে গুচ্ছ ঘাস। সেখানে দুপুরের পরই শীত নামে, ঝোড়ো বাতাস বয়। শীতে নুড়ি বাঁদরের গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে। যেন স্বভাবের নির্দেশে বা বাঁদরির খোঁজে সে নিচের বনের দিকে নামতে লাগল।[৩]

মণীন্দ্র গুপ্তর শৈশবের গ্রাম্যজীবন আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় অজস্র আচার, প্রথা, লৌকিক শব্দ ও উপকরণের সঙ্গে। তাঁর ঘর-বাস্তুভিটা থেকে তিনি ধীরে ধীরে আমাদের নিয়ে যান উঠোন, বাঁশের সাঁকো, পুকুরপাড়, জঙ্গল, শস্য ক্ষেতের কাছে। কৌমবন্ধ বৃহৎ পরিবারের থেকে তিনি চলে যান রোদের আভা, বেলফুল, শশার মাচা, করমচা, বাতাবি লেবু, ঢেঁকি শাক, তেলাকুচো পাতা, কলমি শাক, শাপলা, হিঞ্চে আর থানকুনি পাতার কাছে। দেখা পাই জোনাকির, গোসাপের, পাটখেতের উপর প্রবল বৃষ্টির ধারার। স্বাদ নিই দ্রোণফুলের মধুর আর দুধ থেকে তোলা সদ্য গরম মাখনের। শুনতে পাই নির্জন দুপুরে বাতাসে তালপাতার শব্দ। প্রকৃতির যে প্রগাঢ় সঙ্গ তিনি শৈশবে পেয়েছেন গভীর ঈর্ষা নিয়ে তা পড়ি।

ধর্মকে আলাদা করা যায় না তাঁর প্রকৃতিবোধের সঙ্গে। কারণ প্রকৃতির মধ্যে যে রয়েছে নিজস্ব ধর্ম, সেই প্রাকৃতিক ধর্মকেই তিনি আবিষ্কার করেছেন বারবার প্রকৃতির নানা চিহ্ন, রূপক, প্রতীক এবং টোটেমের সঙ্গে। বাংলায় প্রচলিত নানা গল্প এবং কাহিনি এবং লোকাচারগুলিকে তিনি নিজের মতো করে বিনির্মাণ করেছেন। ঈশ্বরবোধের বা আধ্যাত্মিকতার এক সম্পূর্ণ নিজস্ব আয়না তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, যে আয়নায় তিনি দেখেছেন প্রকৃতির আপাত বিচ্ছিন্ন রূপগুলির মধ্যে অরূপের চিহ্ন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রচলিত ভাবনাগুলির সঙ্গে আধুনিক ভাবনার এক মিলন। আধুনিক ভাষা যদি মণীন্দ্র গুপ্তের কাছে একটা আধার হয়, তবে, প্রকৃতি তার আধেয়। আধেয়কেই তিনি আধারে নিয়ে রচনা করেছেন এক মহাকবিতার বীজ। শিবস্তোত্র সংক্রান্ত কবিতায় যেমন তিনি বলেছেন এক নতুন রূপে সত্য, শিব এবং সুন্দরের উপাসনার কথা। শিব-এর অর্থ স্বয়ম্ভু, যিনি অনাদি এবং অনন্ত। এই মহাপ্রকৃতিই অনাদি এবং অনন্ত। তার সৃষ্টি এবং লয় রয়েছে। সৃষ্টি এবং লয়ের চিরকালীন ছন্দের ভিতরেই প্রকৃতি নিজ রূপ ধারণ করেন।

চোর ডাকাত সংসারী ভিখিরি সবাই এসে
মাথায় হাত বুলিয়ে যায়। ওঁর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।
উনি টের না পেলেও, চোরের হাতের তেলচিটে ছায়া,
ডাকাতের হাতে রক্ষার স্পর্শ, বিষয়ীর হাতের
খট্টাশ গন্ধ, সব ওঁর মাথায় লেগে থাকে।
শিবলিঙ্গের উপর দিয়ে ইঁদুর, সাপ, শুকনো পাতা
আর দিন রাত্রি চলে যায়।
উনি কি ওখানে আছেন, নাকি নেই — বোঝা যায় না।
শুধু যেদিন শিব চৌদশীতে বিবাহযোগ্যা মেয়েরা দলে দলে এসে
ওঁর কাছে দীপ জ্বালে, ছোঁয়
বছরে শুধু সেই একদিনই

বছরে শুধু সেই একদিনই
একটি করস্পর্শে আচম্বিতে ওঁর ভিতরের আগুন ধকধক করে ওঠে —
বাকি তিনশ চৌষট্টি দিন আবার নির্বিকার;
স্মৃতিকে ভস্মের মতো ব্যবহার করেন।
নিজ রূপ ধারণ করেন।[৪] (শিবস্তোত্র ২)

অর্থাৎ এখানেও যে বিষয়টি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো সামগ্রিকতা। অখণ্ডকে ধরছেন মণীন্দ্র গুপ্ত খণ্ড খণ্ড চেতনার মধ্য দিয়ে। ঠিক যেভাবে বাংলা কবিতায় পদাবলি সাহিত্য বা কীর্তনে স্বাভাবিক সহজ কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভাবকে ধরা আছে। সম্পূর্ণতার দর্শনই হলো প্রাকৃতিক বিষয়। কারণ প্রকৃতিতে খণ্ড নয়, পূর্ণতাই আসল। খণ্ড থেকে পূর্ণতায় যাওয়ার সময় কবি বারবার এই প্রকৃতিরই আশ্রয় নিয়েছেন এই কারণেই। ষাট দশকের বাংলা কবিতায় যেখানে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতায় বাংলা কবিতা সরে যাচ্ছে, তখন মণীন্দ্র গুপ্তের দর্শনই তাঁকে টেনে আনছে প্রকৃতির দিকে। ফলে আমরা মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার ভিতর সবসময়েই খুঁজে পাই পাখির গলার আওয়াজ, পাতার শব্দ, আর অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমাবেশ। সেখানে সূর্যাস্ত, সূর্যোদয় এবং শিশিরপতনের শব্দের সঙ্গে কবির কথোপকথন চলে। বলা ভালো, প্রায় একাই, একক লড়াইয়ে, একক অভিযাত্রায়, তিনি প্রকৃতিবাদের তরণী ভাসালেন যখন এক জোয়ার এসেছে প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্নতার। 'শিবরূপ' কবিতায় সারা পৃথিবীর প্রাচীন ঐতিহ্যে শিবার্চনার প্রসঙ্গ দেখিয়েছেন মণীন্দ্র গুপ্ত। লিখেছেন, উত্তরের ভাইকিংদের বংশধরদের নীল চোখে কৈলাসের বরফের ছায়া পড়ে।[৫] প্রসঙ্গত, শিবকে "হিমালয়ের বা উহার পরপারের দেবতা" গণ্য করা হয়।[৬] (চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পৃ. ২৭)। হিমালয়ের পরপারের কুষাণদের মুদ্রায় শিবের মূর্তির চিহ্ন বিদ্যমান। শংকরাচার্যের আমলের আগে থেকেই শৈব যোগীরা ভারতবর্ষে কাজ করছেন। প্রাচীনতম শৈবযোগীদের সম্প্রদায় সম্ভবত পাশুপত, পুরাণ ও মহাভারতে যাঁদের উল্লেখ আছে। পাশুপতদের চর্যার সঙ্গে ধ্রুপদী গ্রিক কাল্ট Cynicsএর অনুরূপতা অনেক গবেষককে বিস্মিত করেছে[৭] (Geoffrey Samuel, p. ২৪১)। এই কবিতায় আন্তর্জাতিক শির্বাচনার সূত্রে উদয়শংকরের নাচ উল্লেখ করেছেন : "শিমকির ডমরুমধ্য কোমরের পার্বতীতনুকে ঘিরে/রাগ শংকরাভরণ ঝকঝক করে উঠত নাচের সময়ে, প্রাচীনেরা সাক্ষী।"[৮] শিলচরে গজাসুর বধ নাচে কিশোর মণীন্দ্র গুপ্ত উদয়শংকরকে শিব ও শিমকিকে পার্বতী সাজতে দেখেছিলেন। তাঁদের হরপার্বতী নাচও দেখেন। মানুষ ও দেবতার সম্পর্ককে যে নানাভাবে খুলে দেখিয়েছেন মণীন্দ্র গুপ্ত, ওই নাচগুলি সম্পর্কে তাঁর করা মন্তব্যও সেদিকে নজর ঘোরায়, যা আসলে মূর্ত ও বিমূর্তের রহস্যময় পারস্পরিকতা : "দুজনে (উদয়শংকর ও শিমকি) দুজনকে আলিঙ্গান করে আছেন অথচ কোথাও স্পর্শ করছেন না"[৯], "রূপলোক ও দেবলোকের যে দরজা সহজে খোলে না তার সামনে আমরা ক্ষুদ্র মানব"[১০] (অক্ষয় মালবেরি, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ৬৪)। কিছু শৈব ও শাক্ত প্রসঙ্গ কি ছেলেবেলায় পড়া বইপত্র থেকেও পাননি? শিলচরে শ্রীমদ্ভাগবত পড়তে গিয়ে নিশ্চয়ই শিবপ্রসঙ্গ পেয়েছিলেন। আরও আগে বরিশালে পড়তে শেখার পর "অর্ধেক মানবী অর্ধেক দেবী"র কাহিনি সম্বলিত অর্ধকালী নামের একটা বই তাঁর "সবচেয়ে ভালো লাগত" : "একদিন বউ পরিবেশন করছে ঘোমটা সরে যেতে জমিদার দেখেন ফরসা বউয়ের কালো রং, মুখের অর্ধেক ত্রিনয়নী কালীর।"[১১] তিনশ বছরেরও আগে ময়মনসিংহে "অর্ধাংশ কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধাংশ গৌরবর্ণ" অর্ধকালী নামে একজন শক্তি উপাসিকার খবর কিন্তু পাওয়া যায়।[১২] ছাত্রজীবনে নিজের পরিবারের পুরুষদের মধ্যে নিশ্চেষ্টতা ও বিত্তের অভাব লক্ষ করে মণীন্দ্র গুপ্ত "দারিদ্র্যদুঃখদহনকারী শিবকে নমস্কার" জানাতেন কেননা তাঁর মনে হতো নিরাসক্ত ভিখিরি শিব তাঁদের 'দারিদ্র্যদুঃখ' ও 'দরিদ্র্যম্মন্যতা' ভস্ম করে দিতে পারেন। "ছেলেটা বগল বাজিয়ে ভিক্ষে চাইল বলে, হঠাৎ বুঝতে পারলাম। ও ভিখিরি, কিন্তু ওর মধ্যে শিবের অংশ আছে" 'শিবরূপ'। কবিতায় অভাবগ্রস্ত জীবের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন অভাবনাশী শিবকে যে এমনভাবে দেখিয়েছেন তারও একটা পশ্চাৎপট আছে : ভিখিরি শৈব সাধুরা মণীন্দ্র গুপ্তদের শিলচরের পাড়ায় বিকেলবেলা এসে শিঙেয় ফুঁ দিতেন এবং নীরবে ভিক্ষে নিয়ে চলে যেতেন। ভিক্ষে দেবার ভার তাঁর ওপর ছিল বলে মূলধারার সমাজের সঙ্গে আলগোছে লেগে থাকা এই ভিক্ষুক সাধুদের সঙ্গে বেশ পরিচয় ছিল কিশোর মণীন্দ্র গুপ্তের। 'প্রথম কদমফুল' কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্তের ভাবনায় আসে — নামগুলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন ভোরের হিমকুয়াশার মধ্যে সূর্যের সরু লম্বা রশ্মি এসে পড়ে।

ধর্মের যে সামগ্রিকতার কথা মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার মধ্যে ধরা পড়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী এক বিস্ময় হিসেবেই বলা যায়। কারণ ধর্মকে ব্যবহার করে, ধর্ম সংক্রান্ত ধারণাকেই এভাবে উন্নীত করার যে ধারা মণীন্দ্র গুপ্তের ভাবনায় ধরা দিয়েছিল, তা এক কথায় বাঙালির ধর্মভাবনাকেই উন্নত করেছে। মণীন্দ্র গুপ্ত, একজন আদ্যন্ত আধুনিক কবি হিসেবে, অস্তি-র সঙ্গে নাস্তি এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সংশয়ও মিশিয়ে দেন। আর সেখানেই শুরু হয় হপকিন্সের বা আলোক সরকারের থেকে তাঁর পার্থক্যের জায়গাটি। কিন্তু অপ্রত্যাশিতের খোঁজে কবি আবহমানের পথে এবং নিজের স্মৃতি অভিজ্ঞতায় পাড়ি দেন সেই অস্তির জায়গা থেকেই। অথচ

পাড়ি দিতে দিতে তিনি খুঁজে পান হাজার অন্ধকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটাই, যে, কখনো কোনো তিক্ততা তাঁর অভিযাত্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তা হয়ত এ কারণেই, যে, প্রকৃতি তাঁর অবচেতনায় বিস্তার লাভ করেছে। প্রচুর ভালোবাসা নিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি জীবনের দিকে। শুধু মানুষ নয়, এই বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুর সঙ্গেই তিনি কথা বলেছেন। শুধু মানুষের জন্য এই পৃথিবী নয়, এ পৃথিবীতে রয়েছে জীব জন্তু, গাছ, রোদ, বাঁশঝাড়ের নিচে খসে পড়া বাঁশের বাকল সবকিছুই। আর তার জন্য হয়ত এই বাংলার প্রকৃতির মন্থর নীরব সংসর্গে চিরকালীন শিশু ও কিশোর এক মণীন্দ্র গুপ্তের একাকী ঘুরে বেড়ানো সত্তার দায় খুব একটা কম নয়। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আরেকটি কবিতা এই আলোচনার পথপ্রদর্শক হতে পারে —

> রাবেয়া চক্রবর্তী আমাকে জোর করে বসিয়ে রেখে গেছে। হাতে কাগজ কলম দিয়ে বলে গেছে — 'বসে থাকুন — চুপচাপ বসে থাকুন — দেখবেন ঠিক আসবে। আজ দু বছর হল আপনি একটি লাইনও লিখছেন না।'
>
> আমি চুপচাপ বসে বসে কবিতা না ভেবে রাবেয়াকে ভাবতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক পরে চমক ভেঙে দেখি, এতক্ষণ সেই কলমে কাগজে অন্যমনে ছাঁদে রাবেয়ার নাম লিখেছি — প্রথমে বাংলায় তার পর ইংরেজিতে, দেবনাগরীতে, তার পরে বানিয়ে বানিয়ে চীনে অক্ষরের অনুকরণে, শেষে আরবী হরফের চালে।
>
> নামগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ যেন ভোরের হিমকুয়াশার মধ্যে সূর্যের সরু লম্বা রশ্মি এসে পড়ে। আমি তেড়েফুঁড়ে উঠি। কালির দোয়াত খুঁজে বার করি — প্যাডের পরের পৃষ্ঠায় খানিকটা কালি ঢেলে দিই — কলম দিয়ে টলটলে কালিকে এদিক ওদিক নিয়ে গিয়ে রাবেয়ার চুল আঁকি। চুলের তলায় ছোট্ট মুখটা আঁকি। পাতার পর পাতায় নানাভাবে তাকে আঁকতে থাকি। তার স্বামীকে আঁকি, তার শ্বশুরশাশুড়িকে আঁকি, ছোট্ট বাচ্চাটা খেলে বেড়াচ্ছে আঁকি। মনের মধ্যে অসম্ভব ভালো লাগতে থাকে — নিজেকে দুর্ধর্ষ লাগে।
>
> বিকেল হয়ে আসে। ফুরফুরে হাওয়া দেয়। আমি রাবেয়ার বাড়ির রাস্তাটা, সদর দরজা, বসবার ঘর, নীল গদি আঁটা কৌচগুলো আঁকি, তার বিকেলের স্নানের জলঝরা শাওয়ার আঁকি।
>
> সারাদিন খাওয়া হয় না। শেষে সন্ধ্যের তারা আঁকি — সাঁঝের বাতি আঁকি — নিশীথরাত্রির নক্ষত্র আঁকি — নক্ষত্রের নিচে কালোয় মিশে গেছে রাবেয়া।
>
> রাত শেষ। প্যাড শেষ, কালির বোতলও প্রায় শেষ।
>
> একটি কবিতার পক্ষে অনেকখানি সময় দিয়ে রাবেয়া অফিস ফেরত পরদিন বিকেলে এল। প্যাডভর্তি আঁকিবুঁকি, একটা বুড়ো লোকের হাতে বালকদের আর্ট দেখে তার হতাশ চোখে প্রথমে রাগ ঝাঁপিয়ে এল, পরে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে হেসে ফেলল।
>
> আর শেষে, খাতার শেষ পাতায় পৌঁছবার অনেক আগেই তার চোখ জলে ভরে গেল।
>
> সে আর কবিতার কথা বলল না, বিদায় বা পুনর্দর্শনের কথাও বলল না। কোনো কথাই না বলে নতমুখে হাতব্যাগটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ('প্রথম কদমফুল', 'কবিতাসমগ্র ১', পৃ. ৫৬, মণীন্দ্র গুপ্ত)

এমন এক আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে তিনি কবিতা লিখেছেন, যে পৃথিবী তখনই বিষের বাষ্পে এবং ধ্বংসের এবং অসাম্যের ভারে পীড়িত। মানুষ প্রকৃতির উপর তার সাম্রাজ্যবিস্তার করে আছে। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার প্রসঙ্গে আমাদের বারুচ স্পিনোজার কথা মনে পড়তে পারে। বারুচ স্পিনোজা ছিলেন সতেরো শতকের একজন ডাচ ইহুদি দার্শনিক। তাঁর লেখালেখি ইউরোপীয় আলোকায়ন এবং সমসাময়িক বাইবেলের সমালোচনার ভিত্তি তৈরি করেছিল। স্পিনোজার 'এথিকস' হলো পশ্চিমা চিন্তাধারার মৌলিক কাজগুলোর অন্যতম। সামগ্রিক বিশ্বতত্ত্ব এবং বাস্তবতার একটি চিত্র বর্ণনার পাশাপাশি একটি নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। স্পিনোজার বইটিতে ঈশ্বরকে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে, মানুষই ঈশ্বরের নানা রূপ। স্পিনোজার ভাবনায়, যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বরের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে।

স্পিনোজার ভাষ্য মতে, "ঈশ্বরই হচ্ছে মহাবিশ্বের বা প্রকৃতির 'একমাত্র' সাবস্ট্যান্স।" তিনি লিখেছেন : 'যা কিছু অস্তিত্বশীল, তা ঈশ্বরের মধ্যেই, ঈশ্বরের ধারণা ছাড়া অন্য কোনো ধারণাকেই গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং গ্রহণ করা হবেও না।' কিন্তু আজও দার্শনিকেরা এই বাক্যের অর্থ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। সাবস্ট্যান্স বা অন্তঃসার বলতে অন্তর্নিহিত সারবস্তুকে বোঝায়। স্পিনোজা ভেবেছিলেন সবকিছুর সারবস্তু একটাই। তাঁর মতে : "'সাবস্ট্যান্স' বলতে আমি বুঝি যা নিজেতেই ব্যাপ্ত এবং যার ধারণা স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্যভাবে বললে, যা থেকে অন্য কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়াই একটি ধারণার জন্ম হতে পারে।"

স্পিনোজার এই 'প্যান্থেইজিম' বা সর্বেশ্বরবাদ অর্থাৎ ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অভেদ কল্পনা ছিল বিশ্ব সম্পর্কে আইনস্টাইনের নিজস্ব আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশ। যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কি না — এর উত্তরে তিনি রাব্বি হারবার্ট এস গোল্ডস্টেইনকে বলেছিলেন :

"আমি স্পিনোজার ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি নিজেকে সমস্ত কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন। এমন একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যিনি ভাগ্য এবং মানবজাতির কর্মকাণ্ড নিয়ে চিন্তিত।"

মণীন্দ্র গুপ্ত নিজেই বলেছেন — "গাছপালা পাখি মাছ জলজন্তু বনের পশু সবাই একদিন সারা পৃথিবীর শিশুর গল্পে ছিল, কবিতার মধ্যেও ছিল। আমাদের মঙ্গালকাব্যে বাঘ, সাপ, এস্কিমো কবিতায় মেরুভল্লুক সীল, আমেরিকান ইন্ডিয়ান কবিতায় কয়োটি, আফ্রিকী কবিতায় বেবুন কত জীবনীশক্তি এনে দিয়েছে। বাংলা কবিতারও মধ্যযুগে পশুপাখিরা যেন লাইন দিয়ে রাজার মহলে এবং গৃহস্থের আঙিনায় ঢুকে পড়ে বেশ জমিয়ে বসেছিল। কবির জগৎটি যেন এই আদিম রহস্যে টইটম্বুর থাকে। সে যেন জীবনের সব সুখে দুঃখে দেশের উদ্ভিদ ও পশুপাখিদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের মতো গায়।" যেমন প্রকৃতি তাঁর কবিতার পথ, সহবাসী ও মোক্ষ, তেমনই প্রকৃতি তাঁর ধর্ম।

ধর্ম এবং ঈশ্বরচেতনায় মণীন্দ্র গুপ্তের তাই ছিল এক স্বতন্ত্র ভাবনা। তাঁর ধর্ম তাঁরই। নিজস্ব এক আধ্যাত্মিক বিশ্বে তিনি বসবাস করতেন এবং প্রকৃতিকে সেভাবেই আবিষ্কার করতেন। প্রকৃতি, কাহিনি, লোকাচার, প্রতীক এবং ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষকে খুঁজে পাওয়ার যে অনন্ত সাধনা তিনি করেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি মণীন্দ্র গুপ্তের কাব্যভুবন।

তথ্যসূত্র :

১। 'অক্ষয় মালবেরি', মণীন্দ্র গুপ্ত, অবভাস, ২০০৬, পৃ. ৭৪
২। 'কবিতাসমগ্র', মণীন্দ্র গুপ্ত, আদম, ২০১৮, পৃ. ৪৬
৩। 'গদ্যসমগ্র', মণীন্দ্র গুপ্ত, আদম, ২০১৮, পৃ. ২৫
৪। 'কবিতাসমগ্র', মণীন্দ্র গুপ্ত, আদম, ২০১৮, পৃ. ৮৬
৫। ওই, পৃ. ২৩৯
৬। ওই, পৃ. ১৫২
৭। ওই, পৃ. ১২২
৮। ওই, পৃ. ৯৯
৯। ওই, পৃ. ১২৩
১০। 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব', বিনয় ঘোষ, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৮৬, পৃ. ৪৪
১১। ওই, পৃ. ৪৩
১২। 'গদ্যসমগ্র', মণীন্দ্র গুপ্ত, আদম, ২০১৮, পৃ. ৯১

আকর গ্রন্থ :

১। মণীন্দ্র গুপ্ত, 'কবিতাসমগ্র', আদম, ২০১৮
২। মণীন্দ্র গুপ্ত, 'গদ্যসমগ্র', আদম, ২০১৮
৩। মণীন্দ্র গুপ্ত, 'নমেরু মানে রুদ্রাক্ষ', চিত্রক পাবলিকেশন, কলকাতা ৭০০০৫৫, কলকাতা বইমেলা ২০০০
৪। মণীন্দ্র গুপ্ত, 'টুং টাং শব্দ নিঃশব্দ', কিশলয় পাবলিকেশন, কলকাতা ৭০০০০৯, কলকাতা বইমেলা জানুআরি ২০০৫
৫। মণীন্দ্র গুপ্ত, 'বনে আজ কনচের্টো', অস্ট্রিক, শিমুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, নভেম্বর ২০০৯
৬। মণীন্দ্র গুপ্ত, 'বাড়ির কপালে চাঁদ', কবিতীর্থ, কলকাতা ৭০০০২৩, জানুআরি ২০১৪
৭। মণীন্দ্র গুপ্ত, 'অক্ষয় মালবেরি' (অখণ্ড), অবভাস প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০৮৪, অক্টোবর ২০০৯

সহায়ক পত্রিকা ও গ্রন্থ :

১। স্বকাল পত্রিকা, মণীন্দ্র গুপ্ত সংখ্যা, ২০১৮
২। আদম পত্রিকা, মণীন্দ্র গুপ্ত সংখ্যা, ২০১৯
৩। ভাস্কর চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র', ভাষাবন্ধন, ২০১৫
৪। সুব্রত চক্রবর্তী, 'বালক জানে না', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯

৫ । তুষার রায়, 'ব্যান্ড মাস্টার', রূপঝুরি প্রকাশন, ১৯৬৯
৬ । আবদুল হাফিজ, 'বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য', ঢাকা, কার্তিক ১৩৮২
৭ । আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'লোকায়ত সমাজ ও বাঙালি সংস্কৃতি', ঢাকা, ভাদ্র ১৩৯৫
৮ । আবুল আহসান চৌধুরী, 'লালন শাহ্', ঢাকা, ১৩৯৬
৯ । আশরাফ সিদ্দিকী, 'লোকসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৩
১০ । আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকশ্রুতি', কলকাতা, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯২
১১ । আহমদ শরীফ, 'বাংলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব', কলকাতা, জানুআরি ১৯৯২
১২ । ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ঢাকা, আশ্বিন ১৩৮১
১৩ । গোপাল হালদার, 'সংস্কৃতির রূপান্তর', ১ম বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৭৪
১৪ । নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালির ইতিহাস — আদিপর্ব, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮২
১৫ । বিনয় ঘোষ, 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব', কলকাতা, আশ্বিন ১৩৮৬
১৬ । বুলবন ওসমান, 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব', ঢাকা, জুলাই ১৯৭৭
১৭ । বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'বাংলাদেশের গ্রাম', ঢাকা, মাঘ ১৩৯০
১৮ । শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, ঢাকা, ভাদ্র ১৩৯২

লেখক পরিচিতি :

বেবী সাউ : বিশিষ্ট কবি, গদ্যকার, গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড